অলংকারে থাকাকালীন আমি একবার সরকারদার, মানে ধীরজ সরকারের দু'শো দশ টাকা লস করিয়ে দিয়েছিলাম। মালটা দু'টাকার দশ বিশ হাজার শেয়ার কিনত আর প্রতিদিন অফিসে এসে আমার পাশে বসে থাকত। কখনো কখনো দু'চার দিনেই শেয়ারের দাম পঞ্চাশ পয়সা হলেও বেড়ে যেত বৈকি। তাতে ব্যাটার পাঁচ দশ হাজার লাভ হয়ে যেত। মাথার উপর অনেক জনের ভিড় নিয়ে এবং একশো কল রিসিভ করতে করতে একবার ভুল করে ফেললাম। এর আগে আমি ওকে অনেক শেয়ারে অনেক প্রফিট দিয়েছি। লাভ করে ও আমার অনেক প্রশংসা করেছিল। বলেছিল, "ডেস্কটপের কি-প্যাড-এ তামসের হাতের আঙুল দেখতে হলে মাইক্রোস্কোপ সঙ্গে নিয়ে বসতে হবে।" কিন্তু সেদিন লস খেয়ে বলল, "ধ্যুর, এত বড় ভুল কি করে করলে ভাই?"

আমি চুপ করে রইলাম।

সরকারদা থামল না। বলল, "বেচতে বললাম শেয়ার আর তুমি কিনা কিনে বসে রইলে! আর কিনেছ কেনো, কিন্তু বেচবে তো তাড়াতাড়ি! হাতই চলে না তোমার! দেখলে তো দামটা কমে গেল আবার?"

তবু আমি চুপ রইলাম। তারপর সরকারদা বেশ কিছুদিন নিয়মিত অফিসে এসেছে কিন্তু টাকার কথা কিছু বলেনি। আমি ভেবেছিলাম সেদিন তাৎক্ষণিক রাগ চড়ে গিয়ে থাকবে। তাই কথা শুনিয়েছে। পরে নিশ্চয় নিজেকে বুঝিয়েছে, আমায় মাফ করে দিয়েছে। টাকার তো আর অভাব নেই তার। কোটিপতি। আর আমি হলাম কিনা সাড়ে চার হাজার টাকা মাইনের এক সামান্য কর্মচারী।

কিন্তু মালটা যে দু'শো দশ টাকার দুঃখ ভোলার নয় তা বুঝলাম যখন তিন মাস বাদে সে আমায় জিজ্ঞেস করল, "তামস, আমার টাকাটা কবে দিচ্ছ?"

আমি এবারও কোন উত্তর দিলাম না।

"কি শুনতে পেলে না নাকি?"

"পেয়েছি।"

"তাহলে চুপ কেন?"

"ভুলে যান না। ওই তো কটা টাকা। আপনার পকেট থেকে তো আর বের করে দিতে হয়নি। দু'শো দশ টাকা প্রফিট কম হল মনে করলেই হয়ে যায়।"

"কি বলছ ভাই! দু'শো দশ টাকা আমি সময়মতো হাতে পেলে আবার শেয়ার কিনতে পারতাম। একদিনেই চারশো টাকা উঠে আসতে পারত। আবার সেটা ইনভেস্ট করলে তার পরদিন আটশো টাকা হত। আবার সেটা দিয়ে...না আর ভাবতে পারছি না কত ক্ষতি করেছ তুমি আমার..."

এক এক দিনেই এক একটা শেয়ার কেনা হয়ে যেত আর এক দিনেই তার দাম ডবল হত! মুখ বন্ধ না করলে আমার ঘুষি উঠে যাবে কিনা তোর মুখে আমি নিজেও জানি না। "এ মাসের মাইনেটা পেলে দিয়ে দেব।"

কিন্তু মাইনে পেয়ে আমি টাকাটা ফেরত দেওয়ার কথা মনে নিয়ে আসিনি। সৈকতই আমায় বলেছিল, "ভুলে যা। মালটা বড় পিশাচ তো। তুই ও যে একটা ছ্যাঁচড়া ওকে বোঝা।"

"ধ্যৎ, ভালো লাগে না এসব করতে। যতটুকু ছ্যাঁচড়ামি করা সম্ভব ছিল করে দিয়েছি আর পারব না," সৈকতের কাছে ভালোমানুষি দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম। "কোথায় থেকে কোন ঝামেলায় ফেঁসে যাব কে জানে।"

"কিচ্ছু হবে না। আমি আছি সাথে বস্।"

মন্দ লাগেনি বস না হয়েও সৈকতের কাছ থেকে বসের সম্মান পেতে।

সৈকত বলেছিল, "এক দু মাসেই বুঝতে পারবি। চুপ থাকলে জানবি তোর ছ্যাঁচড়ামির সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়নি। কাজ হয়ে গেছে। আর তা না হলে বলবি, রোজ এসে আমার মাথার উপর বসে মাথা চেপে ধরেন আপনি। মুখে টেনে চিবোন মাথা। কি থাকে বেঁচে তাহলে আর তার!"

মেনে নিয়েছিলাম আমি সৈকতের পরামর্শ। মনে রেখেও ভুলে গিয়েছিলাম দু'শো টাকার কথা। হিসেব করে দেখেছিলাম ছেড়ে ছেড়ে গুণে গুণে দিন দশেক তিন টাকা দামের সিঙ্গারা খাইয়ে দেব। তাতে মোট তিরিশ টাকা খরচ হবে। তবু বাঁচবে একশো আশি টাকা। সত্যিই শান্ত হয়ে গিয়েছিল ব্যাটা আমার হিসেবের সিঙ্গারা খেয়ে। ছ'মাস আমাকে বিরক্ত করেনি।

তখন আমি অর্পিতার সঙ্গে জমিয়ে প্রেম করে বেড়াচ্ছি। ফোন প্রেম ছেড়ে নিয়মিত আমাদের দেখাসাক্ষাৎ চলছে। অর্পিতার জীবনে তখনও মাসির ছেলে পিসির ছেলে আসেনি। এক রবিবারে শেয়ালদার প্রাচীতে ছুটছি তো অন্য রবিবারে গরিয়াহাটের প্রিয়াতে। তখন আমাদের বিকেলের টিফিন ফুটপাথের এগরোলে সীমাবদ্ধ নেই। পার্ক স্ট্রিটের আরসালান, বারবিকিউ নেশ্ন, সিরাজ গোল্ডেন রেস্টুরেন্ট ছাড়া অন্য কোথাও বসতে মন চায় না। প্রাণ ভরে না ফিস রেশমি কাবাব, বারবিকিউ, মাট্ন চাপ না খেলে। ভালো জায়গায় যেতে হলে ভালো ভালো ড্রেস পরতে হয়, গায়ে রোজ আলাদা আলাদা ডেওড্র্যান্ট স্প্রে করতে হয় আর পকেটও ভারি রাখতে হয়। অফিসে সৈকতের সঙ্গে সেসবই গল্প করছিলাম। সৈকত আমাকে ক্রেডিট কার্ডের আইডিয়া দিল। বলল, "আমার একজন পরিচিত আছে। তাকে দিয়ে তুই এইচ ডি এফ সি ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড পেতে পারিস।"

কয়েকদিনের মধ্যেই এইচ ডি এফ সি ব্যাংক থেকে একজন এল। এখন ক্রেডিট কার্ড পেতে গেলে ভালো চাকরি করার প্রয়োজন হয়। সরকারি চাকরি হলে ভালো, বেসরকারি হলে মাইনে

মোটা আর পদ স্থায়ী হতে হবে। এছাড়া তারা সিভিল রেকর্ড চেক করবে। অনেক ব্যাপার থাকে। আগে এমন ছিল না।

আমার ক্রেডিট কার্ড পেতে স্যালারি স্লিপেরও দরকার পড়ল না। তামস রায় চাকরি করছে এটাই তার সবথেকে বড় পরিচয়। চাকরি মানে কাজ, কাপড়ের দোকানেই হোক আর শৃঙ্গার মেশিনের কম্পানিতেই হোক আর কয়লার কম্পানিতেই হোক আর অলংকারেই হোক। আর স্যালারি! আমার মনে হয় একশো টাকা হলেও কোন অসুবিধে হত না। ক্রেডিট কার্ড শুধু আমিই পেলাম না। আমার দেখাদেখি সৈকত নিজেও পেতে চাইল। মিহিরও পেল ক্রেডিট কার্ড। এমনকি আমাদের অফিস বয় লক্কুও বাদ গেল না।

সৈকত বিবাহিত। বউ বাচ্চার চাহিদা, সংসারের চাহিদা মেটাতে ওর হঠাৎ করে টাকার প্রয়োজন আসতেই পারে। মিহির মা-বাবার দেখে দেওয়া মেয়ে বিয়ে করবে। বাড়ি থেকে দেখাশোনা চলছে। একটাই ছেলে। চাকরি ভালো না করলে কি হবে, লেক গার্ডেনসে বাবার তিনটে ফ্ল্যাট আছে। ফ্ল্যাটের নিচে গ্যারাজ আছে, দোকান আছে ভাড়াতে দেওয়া। মিহিরের প্রেমিকা নেই, আমার মতো পার্ক স্ট্রিটের আরসালান, বারবিকিউ নেশ্ন, সিরাজ গোল্ডেন রেস্টুরেন্টে হিরোগিরি দেখিয়ে ঘুরে ফিস রেশমি কাবাব, বারবিকিউ, মাট্ন চাপের অর্ডার দেওয়া নেই। ওর টাকা ধার নেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল জানি না।

ক্রেডিট কার্ড পেয়ে আমি মনের সুখে নিজেকে সাজাতে শুরু করলাম। আগে পিছে না তাকিয়ে। অর্পিতাকেও যে সাজাইনি তা নয়। অর্পিতাকে চুড়ি দিয়েছি, মাথার ক্লিপ দিয়েছি। টিপ, লিপস্টিক, রুজ, পার্স দিয়েছি। সবচেয়ে বড় কথা অর্পিতা যাকে মাসির ছেলে বলেছিল তার জন্য একটা দেড় হাজার টাকা দিয়ে লেদারের বেল্ট কিনেছি, মানে অর্পিতা কিনতে চেয়েছিল গিফট করবে বলে, আমি টাকা পে করেছি সেই গড়িয়াহাট মার্কেট থেকেই।

আমার ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করার কথা শুনে ক্লাবে কার্তিক বলেছিল, "এতদিনে ভদ্রমানুষ হোলি।"

আমি বুঝতে পারিনি, তাই জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কেন?"

"বা রে, ভদ্র লোন নিচ্ছিস!"

আমি তাও বুঝিনি, আবার জিজ্ঞেস করেছলাম, "কি?"

"আরে বাবা, ব্যাংক থেকে লোন ওঠাচ্ছে কে? আমি না তুই?"

"আমি। তো?"

শিবু একটু দূরে একটা চেয়ারের ব্যাক রেস্টে বাঁ হাতটা রেখে টেরা হয়ে বসে আমাদের কথা শুনছিল। সে আমার 'কেন, কি, তো'-এর জ্বালায় অস্থির হয়ে চেয়ারটা আমার পাশে টেনে নিয়েছিল। ডান হাতটা আমার মাথার ব্রহ্মতালুতে বুলিয়ে বলেছিল, "গবেট কোথাকার। এই মুণ্ডি

নিয়ে সুব্রত সরকারের বিজনেস কি করে সামলাচ্ছিস কে জানে! আমরা আগে সুদখোরের কাছ থেকে সুদে টাকা ধার নিতাম। তুই ব্যাংক থেকে টাকা ধার নিচ্ছিস। সুদখোর গোবেচারাগুলোর কাছ থেকে সুদ খেত। ব্যাংকও খায়। সুদখোরগুলোকে আমরা নিচুমানের লোক বলে মনে করতাম। কিন্তু ব্যাংককে তো তাই ভাবি না। ব্যাংক হল ব্যাংক। ভদ্র জায়গা। ভদ্র সুদখোর।"

শিবুর কথা শুনে ব্যাংককে সত্যি আমার ভদ্র জায়গা বলেই মনে হয়েছিল। বলেছিলাম, "এইচ ডি এফ সি আমার কাছে এখনও পর্যন্ত টাকা শোধ করার জন্য একবারও চাপ দেয়নি।"

আশিস বলেছিল, "চাপ দেওয়ার সময় এখনও আসেনি রে।"

আশিসের কথার সারপদার্থ উদ্ধার না করে আমি আরেকটি ক্রেডিট কার্ড নিলাম। এস বি আই-এর। সেখান থেকেও লোন ওঠাতে থাকলাম ইচ্ছেমত।

ছয়মাস বাদে একদিন আমি অফিসে ঢুকতেই মালিক সুব্রত সরকার আমাকে তার কেবিনে ডেকে পাঠাল। দেখি সেখানে আরেক সরকার বসে আছে। ধীরজ সরকার। দুই সরকারকে একসঙ্গে দেখে আমার খুব একটা ভালো লাগল না। সুব্রত সরকার আমাকে ধীরজ সরকারের পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে বলল, "বসো।"

বসলাম।

সুব্রত সরকার বলল, "তুমি নাকি এনার দু'শো দশ টাকার লস করিয়ে দিয়েছ?"

আমি চুপ।

"এতদিনেও তুমি এনার টাকাটা ফেরত দাওনি। জানো উনি এখন তোমার কাছ থেকে সুদসহ চারশো কুড়ি টাকা চার্জ করছেন?"

চারশো! কুড়ি! ছয় মাসে দু'গুন টাকা! চমকে উঠি। ভাবি এই লোকটা তো অভদ্র সুদখোরের চেয়েও বেশি অভদ্র।

"টাকাটা দু'দিনের মধ্যে ক্লিয়ার করো। নইলে উনি তোমার বিরুদ্ধে কোর্টে যাবেন।"

ওরেবাবা, এতো চারশো কুড়ি টাকা নিয়ে ফোর টুয়েন্টির কেস!

"তাছাড়া আমিও তোমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করব।"

আমার ব্লাড প্রেসার হাই হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি থেকে পকেটে তিনশো আশি টাকা নিয়ে বেরিয়েছিলাম। অর্পিতার এয়ারটেল সিমে তিনশো তেতাল্লিশ টাকার রিচার্জ করে দেওয়ার ছিল। সেটা হল না। তিনশো আশি থেকে তৎক্ষণাৎ দুশো দশ টাকা বের করে দিয়ে বলেছিলাম, "আপনাকে টার্মিনেশন লেটার তৈরি করার কষ্ট করতে হবে না। আমিই রেজিগনেশন লেটার দেব।" বসের কেবিন থেকে বেরিয়ে রেজিগনেশন লেটার টাইপ করতে করতে সৈকতের ওপর চিল্লিয়েছিলাম খুব আমাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য।